أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 102) www.motaher21.net

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে,"

" Who believe in the Ghaib."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৩

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۙ

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

৩ নং আয়াতের তাফসীর:

আলোচ্য আয়াত তিনটিতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীন বা মু'মিনদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। (المتقين) মুত্তাকীন শব্দটি (المتقي) মুত্তাকী-এর বহুবচন। অর্থ- যারা পরহেয করে চলেন। একজন বান্দা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বাচার জন্য তার ও আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও শাস্তির মাঝে যে প্রতিবন্ধক নির্ধারণ করে নেয় তাই হল তাকওয়া। সে প্রতিবন্ধক হল- আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং তাঁর অবাধ্য কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন: দিনের বেলা সিয়াম পালন, রাতের বেলা কিয়াম করার নাম তাকওয়া নয়। বরং তাকওয়া হল আল্লাহ

তা'আলা যা হারাম করেছেন তা বর্জন করা এবং যা ফরয করেছেন তা আদায় করা। এরপরেও যাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়েছে তা ভালোর ওপর ভাল।

সুতরাং মুত্তাকী হলেন তারা, যারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকেন।

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

কুরআন থেকে লাভবান হবার জন্য এটি হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত। 'গায়েব' বা অদৃশ্য বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত এবং কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, অহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি অনুভব করা যায় না এমন সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে, একমাত্র সে-ই কুরআনের হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মেনে নেয়ার জন্য দেখার, ঘ্রাণ নেয়ার ও আস্বাদন করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও ওজন করা যায় না—সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা লাভ করতে পারবে না।

(غيب)-এর অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না। কুরআনে (غيب) শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। এখানে (غيب) শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামতে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশ্তাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা আল-বাকারাহ্র (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ) আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আর এ সূরারই শেষে ২৮৫ নং আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

ঈমান কি?

আবূ জা'ফর আর রাযী (রহঃ) বলেনঃ 'আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন যে, সত্য বলে স্বীকার করাকে ঈমান বলে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-ও বলেন তারা ইমান আনার অর্থ হলো তারা সত্যায়ন করে। যুহরী (রহঃ)

বলেন যে, ‘আমলকে ঈমান বলা হয়। রাবী‘ ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন যে, ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে ‘অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা।’ (তাফসীর তাবারী ১/২৩৫) ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ সম্পর্কে উত্তম কথা হলো এই যে, তারা মুখের দ্বারা, অন্তর দ্বারা ও ‘আমল দ্বারা অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনয়নের মাধ্যমে বৈশিষ্টমাণ্ডিত হওয়া। অবশ্য মহান আল্লাহর ভয়ও ইমান এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।’ যা মূলত ‘আমলের মাধ্যমে কথার স্বীকৃতি দেয়া। ‘ঈমান’ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক যা মহান আল্লাহর ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের (আঃ) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বীকৃতিকে সত্যায়ন করা।

আমি বলি যে, আভিধানিক অর্থে শুধু সত্য বলে স্বীকার করাকেই ঈমান বলে। কুর’আন মাজীদেও এ অর্থের ব্যবহার এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে আর মু’মিনদের বিশ্বাস করে। (৯ নং সূরাহ্ তাওবাহ, আয়াত নং ৬১)

ইউসুফ (রাঃ)-এর ভাইয়েরা তাদের পিতাকে বলেছিলোঃ

﴿وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ﴾

কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। (১২ নং সূরাহ্ ইউসুফ, আয়াত নং ১৭) অনুরূপভাবে যখন তা ‘আমলের সাথে যুক্ত হয়ে আসবে তখনও ঈমান অর্থ সত্য বলে স্বীকার করা।

﴿اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾

কিন্তু তাদের নয়, যারা মু’মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ। (৯৫ নং সূরাহ্ ত্বীন, আয়াত নং ৬)

কিন্তু যখন এটা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হবে তখন এর দ্বারা শার‘ঈ ঈমানই উদ্দেশ্য যা দৃঢ় বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংঘঠিত হয়। অধিকাংশ ইমামগণ এরূপ মত পোষণ করে থাকেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম, ১/৩৫) বরং ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ), ইমাম আবূ ‘উবাইদাহ (রহঃ) প্রভৃতি ইমামগণ একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মুখে উচ্চারণ করা ও কার্যসাধন করার নাম হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বহু হাদীসে এর প্রমাণ আছে যা সহীহুল বুখারীর শরাহর প্রথমাংশে বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ মহান আল্লাহরই।

কেউ কেউ ঈমানের অর্থ করেছেন ‘মহান আল্লাহর ভয়।’ যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾

নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রভুকে না দেখেই ভয় করবে। (৬৭ নং সূরাহ্ মূল্ক, আয়াত নং ১২)

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেনঃ ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ﴾

যারা না দেখেই দয়াময় মহান আল্লাহর ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়। (৫০ নং সূরাহ্ কাফ, আয়াত নং ৩৩) প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে ঈমান ও ‘ইল্মের সারাংশ।

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾

মহান আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (৩৫ নং সূরাহ্ ফাতির, আয়াত নং ২৮)

কেউ কেউ বলেন, তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান আনার ন্যায় অদৃশ্যের প্রতিও ঈমান আনে। তারা কখনোই ঐ মুনাফিকদের ন্যায় নয়, যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾

যখন তারা মু’মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শায়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, ‘আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র’। (২ নং সূরাহ্ আল বাকারাহ, আয়াত নং ১৪) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

﴿اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُه وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ﴾

মুনাফিকেরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই মহান আল্লাহ্‌র রাসূল।’ মহান আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (৬৩ নং সূরাহ আল মুনাফিকূন, আয়াত-১)

এই অর্থ হিসেবে بالغيب শব্দটি حال হবে, অর্থাৎ তারা ঈমান আনয়ন করে এমন অবস্থায় যে, মানুষ হতে তা গোপন থাকে।

গায়েব হল যা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ওয়াহী ব্যতীত পঞ্চেন্দ্রীয় ও জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি।

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন: গায়েবের প্রতি ঈমান আনা হল- আল্লাহ তা'আলার প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, রাসূলদের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, জান্নাত ও জাহান্নাম, আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত লাভের প্রতি এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনা। কাতাদাহও (রহঃ) এ মত পোষণ করেছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করে বলেন: গায়েব হল- যা বান্দাদের থেকে অনুপস্থিত থাকে। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম এবং কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে।

গায়েবের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম একটি দিক হল- এ গায়েব আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি জানে না। কোন ওলী-আউলিয়া, বিদ্বান, মুর্শিদ এমনকি নাবী-রাসূলগণও না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ)

"বল 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" (সূরা নামল ২৭:৬৫)

এরূপ ৫৪টিরও বেশি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র গায়েবের খবর রাখেন অন্য কেউ নয়। এমন কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও গায়েব জানেন না, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঘোষণা দেয়ার জন্য বলেন:

(قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ)

“বল: ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের ওপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।’(সূরা আ‘রাফ ৭:১৮৮)

তবে আল্লাহ তা‘আলা নাবী-রাসূলদের মাঝে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ওয়াহীর মাধ্যমে যতটুকু গায়েবের তথ্য জানিয়েছেন ততটুকুই তিনি জানেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰي غَيْبِهٖٓ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضٰي مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْم بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا)

“তিনি গায়েবের অধিকারী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি তার সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।”(সূরা জিন ৭২:২৬-২৭)

এ গায়েবের খবর জানার একমাত্র মাধ্যম হল ওয়াহী, কোন প্রকার কাশফ বা ইলহামের মাধ্যমে নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ)

“এসব গায়েবের সংবাদ ওয়াহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানাই। তুমি তো সে সময় তাদের কাছে ছিলে না যখন মারইয়ামের অভিভাবক কে হবে এজন্য তারা লটারী করেছিল এবং তুমি তো তখনও তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তর্ক-বিতর্ক করছিল।”(সূরা আলি ইমরান ৩:৪৪)

এরূপ সূরা হূদের ৪৯ নং ও সূরা ইউসুফের ১০২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে গায়েব জানার একমাত্র মাধ্যম হল ওয়াহী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস। আর আমরা জানি নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতেকালের পর ওয়াহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং কেউ গায়েব জানে এ দাবি করার সুযোগ নেই। যদি কেউ গায়েব জানে ও তার কাছে ওয়াহী আসে বলে দাবি করে সে নিশ্চয়ই শয়তানের বন্ধু ও তার অনুসারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰٓي أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ)

“নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের কাছে ওয়াহী করে তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্য।” (সূরা আন‘আম ৬:১২১)

সুতরাং আমরা বিশ্বাস করব- গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা জানেন, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। কোন ওলী-আউলিয়া, ফকীর, গাউস-কুতুব ও পীর-দরবেশ এ জ্ঞান রাখে না। যদি কেউ গায়েব জানার দাবি করে তাহলে নিশ্চয়ই সে শয়তানের বন্ধু ও অনুসারী।

‘গাইব’ বলতে কি বুঝায়

غَيْب শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মুফাস্সিরগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঐ সবগুলোই সঠিক এবং সব অর্থই উদ্দেশ্য পূর্ণ। আবূ জা‘ফর আর রাযী (রহঃ) আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর ওপর, ফিরিশতাগণের ওপর, কিতাবসমূহের ওপর, কিয়ামতের ওপর, জান্নাতের ওপর, জাহান্নামের ওপর, মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ওপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কাতাদাহ ইবনু দিয়ামাহ (রহঃ)-এরও এটাই অভিমত। (তাফসীর তাবারী ১/২৩৬)

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ), ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) সহ একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, গাইব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের ঐ সমস্ত বিষয়াদী যা কুর’আনে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বান্দার নিকট অদৃশ্যমান।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর একটি মত উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক যা কিছু এসেছে তার সবই গাইব দ্বারা উদ্দেশ্য। আর সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, গাইব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল কুর‘আন।

একবার ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর মাজলিসে সাহাবীগণের গুণাবলীর আলোচনা চলছিলো। তিনি বলেনঃ যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছেন তাদের তো কর্তব্যই হলো তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা; কিন্তু মহান আল্লাহর শপথ! ঈমানী মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই উত্তম যারা না দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকেন। তারপর তিনি ﴿الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ الۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ الَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِالۡغَيۡبِ﴾ পর্যন্ত পাঠ করলেন।’ (মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪, মুসতাদরাক হাকিম ২/২৬০) ইমাম হাকিম এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলে থাকেন। মুসনাদ আহমাদেও এ বিষয়ের একটি হাদীস আছে। ইবনু মুহাইরীজ (রহঃ) আবূ জুমু‘আহ (রাঃ) নামক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘এমন একটি হাদীস আমাকে শুনিয়ে দিন যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন। তিনি বলেনঃ ‘আচ্ছা, আমি আপনাকে খুবই ভালো একটা হাদীস শুনাচ্ছি। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে

নাশ্তা করছিলাম। আমাদের সাথে আবূ ‘উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি বলেনঃ ‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!

هَلْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي.

‘আমাদের চেয়েও উত্তম আর কেউ আছে কি? আমরা আপনার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সাথে ধর্ম যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।’ তিনি বললেনঃ ‘হ্যাঁ, আছে। ঐ সমুদয় লোক তোমাদের চেয়ে উত্তম যারা তোমাদের পরে আসবে এবং আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখতেও পাবে না।’ (হাদীস সহীহ। মুসনাদ আহমাদ ৪/১০৬, ১৬৯৭৬)

তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই এ রয়েছে সালিহ ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেনঃ আবূ জুমু‘আহ আনসারী (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে আমাদের নিকট আগমন করেন। রিযা ইবনু হাইআহ্ (রাঃ)-ও আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি ফিরে যেতে থাকলে আমরা তাঁকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে সাথে চলি। তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বলেনঃ ‘আপনাদের এই অনুগ্রহের প্রতিদান ও হক আমার আদায় করা উচিত। শুনে রাখুন! আমি আপনাদেরকে এমন একটা হাদীস শুনাবো যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনেছি।’ আমরা বলিঃ ‘মহান আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন! আমাদের তা অবশ্যই বলুন।’ তিনি বললেনঃ ‘শুনুন! আমরা দশজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-ও ছিলেন। আমরা বললামঃ ‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদের চেয়েও কি বড় সাওয়াবের অধিকারী আর কেউ হবে? আমরা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার সাথে জিহাদ করছি। তিনি বললেনঃ

مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُوْلُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يَأْتِيْكُمْ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، بَلْ قَوْمٌ مَنْ بَعْدَكُمْ يَأْتِيْهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَعْمَلُوْنَ بِمَا فِيْهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا" مَرَّتَيْنِ.

‘তোমরা কেন করবে না? মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো স্বয়ং তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। আকাশ থেকে মহান আল্লাহর ওয়াহী তোমাদের সামনেই বার বার অবতীর্ণ হচ্ছে। ঈমান তো ঐ সব লোকের যারা তোমাদের পরে আসবে, তারা দুই জিলদের মধ্যে কিতাব পাবে এবং তার ওপরই ঈমান এনে ‘আমল করবে। তারাই তোমাদের দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী।’ (ইবনু আসাকীর ৬/৩৬৮) এই হাদীসটি তাদের প্রার্থনা কবুল হওয়ার দালীল যাতে হাদীস বিশারদগণের মাঝে মতভেদ বিদ্যমান। যেমনটি আমি সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। কেননা পরবর্তীদের প্রশংসা এর ওপরে ভিত্তি করেই হচ্ছে এবং এই হিসেবেই তাদেরকে বড় পুণ্যের অধিকারী বলা হয়েছে। নতুবা সাধারণভাবে তো সাহাবীগণই (রাঃ) প্রত্যেক দিক দিয়েই উত্তম। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟". قالوا: الملائكة. قال: "وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟". قالوا: فالنبيون. قال: "وما لهم لا يؤمنون " والوحي ينزل عليهم؟". قالوا: فنحن. قال: "وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟". قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن أعجب الخلق إليّ إيمانا لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يَجدونَ صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها"

তোমাদের মাঝে ঈমানের দিক থেকে সর্বোত্তম কে? তারা বললো ফিরিশতাগণ। তিনি বলেন, তারা কেন ঈমান আনবে না? তারা তো প্রভুর নিকটেই আছে। সাহাবীগণ বললেন, তারপর নবীগণ। তিনি বলেন, তারা ঈমান আনবে না কেন? তাদের ওপর তো ওয়াহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। সাহাবীগণ বললেন, তাহলে আমরা। তিনি বলেন, তোমরা কেন ঈমান আনবে না অথচ স্বয়ং আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। তবে আমার মতে সর্বোত্তম ঈমানদার তারাই যারা তোমাদের পরে আসবে তারা কিছু কিতাব সম্বলিত সহীফা পাবে এবং তার ওপরই তারা ঈমান আনবে। (আল ইসাবা, মুসতাদরাক হাকিম ৪/৮৫, ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী স্বীয় তারীখের মধ্যে (২/৩১১) উল্লেখ করেছেন) এর সনদে মুগীরাহ ইবনু কায়িস রয়েছে যাকে আবূ হাতিম আর রাযী মুনকারুল হাদীস বলে আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য অনুরূপ একটি হাদীস দুর্বল সনদে মুসনাদ আবূ ইয়া'লা তাফসীরে ইবনু মারদুওয়াই এবং মুসতাদরাক হাকিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর হাকিম তাকে সহীহও বলেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও মারফূ' সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সঠিক বিষয়ে মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম বুদাইলা বিনতে আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন একবার আমরা বানূ হারিসার মাসজিদে যোহর বা 'আসরের সালাতে ছিলাম এবং আমাদের চেহারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিলো। দু'রাকা'আত পড়া হলে কোন একজন এসে সংবাদ দিলো যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল্লার দিকে মুখ করেছেন। এ সংবাদ শোনা মাত্রই আমরা বায়তুল্লার দিকে চেহারা ঘুরে নিলাম। স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের জায়গায় চলে আসলো আর পুরুষ লোকেরা স্ত্রী লোকদের জায়গায় চলে গেলো। আর এভাবেই বাকী দু'রাকা'আত আমরা বায়তুল্লার দিকে চেহারা করেই আদায় করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন, এসব লোক তারাই যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস করে থাকে। এই সনদে এই হাদীসটি গারীব।

﴿وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

আর সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও আমি তাদেরকে যে জীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে দান করে থাকে। (২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং ৪)

ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'কোন বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া'। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইমান বলতে বুঝায়, কোন বিষয়ে মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কাজে পরিণত করা। এখানে ঈমানের তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্তরে অকপট চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। দ্বিতীয়তঃ সে বিষয়ের স্বীকৃতি মুখে দেয়া। তৃতীয়তঃ কর্মকাণ্ডে তার বাস্তবায়ন

করা। শুধু বিশ্বাসের নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইব্‌লিস, ফির'আউন এবং অনেক কাফেরও মনে মনে বিশ্বাস করত। কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। তদ্রুপ শুধু মুখে স্বীকৃতির নামও ঈমান নয়। কারণ মুনাফেকরা মুখে স্বীকৃতি দিত। বরং ঈমান হচ্ছে জানা ও মানার নাম। বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কার্যে পরিণত করা -এ তিনটির সমষ্টির নাম ঈমান। তাছাড়া ঈমান বাড়ে ও কমে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঈমান বিল-গায়েব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হেদায়াত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্‌লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ট দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

'ঈমান বিল গায়েব' সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গায়েবের বিষয়াদির উপর ঈমান আনার চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারও হতে পারে না। তারপর তিনি এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সাথে জিহাদ করেছি, আমাদের থেকে উত্তম কি কেউ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, তারা তোমাদের পরে এমন একটি জাতি, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে [সুনান দারমী: ২/৩০৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৮৫]

মূলত: এটি 'ঈমান বিল গায়েব' এর একটি উদাহরণ। সাহাবা, তাবে'য়ীনদের থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় ঈমান বিল গায়েবের বিভিন্ন উদাহরন পেশ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, কুরআন। আবার কেউ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ:৯৯] এ সবগুলোই ঈমান বিল গায়েবের উদাহরণ। ঈমানের ছয়টি রুকন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ঈমান বিল গায়েবের মূল অংশ।

'ইকামতে সালাত' এর অর্থ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'তারা ফরয সালাত আদায় করে, রুকূ'-সাজদাহ, তিলাওয়াত, নম্রতা এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত করে।' (তাফসীর তাবারী ১/২৪১)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে সালাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ভালোভাবে ওযূ করা এবং রুকূ' ও সাজদাহ যথাযথভাবে আদায় করা। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭) মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, সময়ের হিফাযত করা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, রুকূ' ও সাজদাহ ধীর-স্থিরভাবে আদায়

করা, ভালোভাবে কুর'আন পাঠ করা, আত্তাহিয়্যাতু এবং যথাযথভাবে দরূদ পাঠ করার নাম হচ্ছে ইকামতে সালাত। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭)

'সালাত'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা বা দো'আ। শরী'আতের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদাত, যা আমাদের নিকট 'নামায' হিসেবে পরিচিত। কুরআনুল কারীমে যতবার সালাতের তাকীদ দেয়া হয়েছে - সাধারণতঃ ইকামত' শব্দের দ্বারাই দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এ জন্য 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। 'ইকামত' এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি, দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য 'ইকামত' স্থায়ী ও স্থিতিশীল অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'ইকামাতুস সালাত' অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে সালাত আদায় করা। শুধু সালাত আদায় করাকে 'ইকামাতুস সালাত' বলা হয় না। সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কুরআনুল কারীমে আছে – 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। [সূরা আল-আনকাবুত:৪৫]

বস্তুত: সালাতের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন সালাত উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনেক সালাত আদায়কারীকে অশ্লীল ও নেক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা সালাত আদায় করেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। সুতরাং সালাতকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হবে। 'ইকামত' অর্থে সালাতে সকল ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। তাছাড়া সময়মত আদায় করা। সালাতের রুকু, সাজদাহ, তিলাওয়াত, খুশু, খুযু ঠিক রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবনে কাসীর] ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সকল সালাতের জন্য একই শর্ত। এক কথায় সালাতে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরী'আতের নিয়মানুযায়ী আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইকামতে সালাত। তন্মধ্যে রয়েছে - জামাআতের মাধ্যমে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। আর তা বাস্তাবায়নের জন্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার তদারকির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী কল্যাণ-রাষ্ট্রের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে সালাত কায়েম করাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের অন্যতম কর্ম বলে ঘোষণা করে বলেনঃ "যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। " [সূরা আল-হাজ্জঃ ৪১]

এটি হচ্ছে তৃতীয় শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে, যারা কেবল মেনে নিয়ে নীরবে বসে থাকবে তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং মেনে নেয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তার আনুগত্য করা ও তাকে কার্যকর করাই হচ্ছে এ থেকে উপকৃত হবার জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। আর বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী

আলামত হচ্ছে নামায। ঈমান আনার পর কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুয়াযযিন নামাযের জন্য আহবান জানায় আর ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি বাস্তবে আনুগত্য করতে প্রস্তুত কি না তার ফায়সালা তখনই হয়ে যায়। এ মুয়াযযিন আবার প্রতিদিন পাঁচ বার আহবান জানাতে থাকে। যখনই এ ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া না দেয় তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি এবার আনুগত্য থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই নামায ত্যাগ করা আসলে আনুগত্য ত্যাগ করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য কোন ব্যক্তি যখন কারোর নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে না তখন তাকে নির্দেশ দেয়া আর না দেয়া সমান।ইকামাতে সালাত বা নামায কায়েম করা একটি ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক পরিভাষা একথাটি অবশ্যি জেনে রাখা প্রয়োজন। এর অর্থ কেবল নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায পড়ে থাকে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরযটি আদায় করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেখানে নামায কায়েম আছে, একথা বলা যাবে না।

মুত্তাকীন বা মু'মিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে শতাধিক বার সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কখনো সালাতের প্রতি নির্দেশ, কখনো উৎসাহ প্রদান, কখনো ভীতি প্রদর্শন, কখনো সফলকামের কথা উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহও (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে সালাতের অনেক গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়া, সালাত কায়িম করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লায় হাজ্জ পালন করা। (সহীহ বুখারী হা: ৮)

তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

নিশ্চয়ই মু'মিন এবং মুশরিক ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত বর্জন করা। (সহীহ মুসলিম হা: ৮২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের থেকে বাইয়াত বা প্রতিশ্র"তি গ্রহণ করতেন তাদের জন্য সালাত কায়িম করা শর্ত করে দিতেন। (সহীহ বুখারী হা: ৫৭)

ইকামাতুস সালাত:

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সালাত পড়ার কথা বলেননি বরং বলেছেন সালাত কায়িম করার কথা। ইকামাতুস সালাত অর্থ বাহ্যিকভাবে সালাতের রুকন, ওয়াজিব ও শর্তসহ যথাসময়ে আদায় করা এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিনয়-নম্রতা ও অন্তরের উপস্থিতিসহ যা পাঠ করা হয় তা অনুধাবন করে আদায় করা। (তাফসীর সা'দী: ১৭)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: ইকামাতুস সালাত হল তার ফরযসহ আদায় করা। তিনি আরো বলেন, ইকামাতুস সালাত হল- রুকু, সিজদাহ, তেলাওয়াত পরিপূর্ণ করতঃ বিনয়-নম্রতার সাথে অন্তরের উপস্থিতিসহ আদায় করা।

ইবনু জারির আত-তাবারী (রহঃ) বলেন: ইকামাতুস সালাত হল সালাতের যে সকল ফরয, ওয়াজিব ও বিধি-বিধান আছে তা যথাযথভাবে আদায় করা। (তাফসীর আত-তাবারী: ১/১৬৮) আর তা অবশ্যই হতে হবে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তরীকায়। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

তোমরা যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবেই আদায় কর। (সহীহ বুখারী হা: ৬৩১)

সালাত আদায় করতে হবে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তরীকায়, অন্য কোন মত ও কারো দেখনো পদ্ধতিতে নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কারো তৈরি করা পদ্ধতিতে ইবাদত সম্পাদন করলে তা আল্লাহ তা'আলার কাছে কবূল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের নির্দেশ বহির্ভূত তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮)

সুতরাং ইকামাতুস সালাত হল নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদ্ধতির আলোকে সালাতের সকল ফরয, ওয়াজিব ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে আদায় করা।

অতএব যারা সালাত কায়িম দ্বারা সমাজের সকল ব্যক্তিকে নিয়ে সালাত আদায় করাকে বুঝান, যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঠিক পদ্ধতি অনুসারে না হয়। তাদের এ বুঝ কুরআন ও

সুন্নাহর পরিপন্থী। কেননা সালাত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী না হলে তা আল্লাহ তা‘আলার কাছে গ্রহণযোগ্যই হবে না।

‘সালাত’ কি

‘আরবী ভাষায় সালাতের অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা। আবার কবিদের কবিতা এর সাক্ষ্য দেয়। সালাতের প্রয়োগ হয়েছে সালাতের ওপর যা রুকূ’ সাজদাহ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতকগুলো কাজের নাম এবং যা নির্দিষ্ট সময়ে কতোগুলো নির্দিষ্ট শর্ত, সিফাত ও পদ্ধতির মাধ্যমে পালিত হয়। ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, সালাত সালাত বলার কারণ এই যে, সালাত আদায়কারী ব্যক্তি স্বীয় কাজের মাধ্যমে পুণ্য প্রার্থনা করে এবং মহান আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজন পূরণের আবেদন করে।

কেউ কেউ বলেছেনঃ যে দু’টি শিরা পৃষ্ঠদেশ থেকে মেরুদণ্ডের অস্থিও দু দিকে এসে থাকে তাকে ‘আরবী ভাষায় صلوين বলা হয়। আর সালাতে এটা নড়া চড়া করে বিধায় তাকে صلاة বলা হয়েছে। কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক নয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন এটা صلي থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সংলগ্ন ও সংযুক্ত থাকা। যেমন কুর’আন মাজীদে আছে, لا يصلها إلا الأتقى অর্থাৎ দুর্ভাগা ব্যক্তি ছাড়া কেউই জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না। (সূরাহ আল লাইল, আয়াত ১৫)

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, যখন কাঠকে সোজা করার জন্য আগুনের ওপর রাখা হয় তখন ‘আরববাসীরা تصلية বলে থাকে। সালাতের মাধ্যমে আত্মার বক্রতাকে সোজা করা হয় বলে একে صلاة বলা হয়েছে। যেমন কুর’আন মাজীদে আছেঃ ﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

‘নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’ (২৯ নং সূরাহ আল ‘আনকাবুত, আয়াত নং ৪৫) তবে যে যা-ই বলুক, صلاة এর অর্থ প্রার্থনা হওয়াই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও প্রসিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য এটি হচ্ছে চতুর্থ শর্ত।

‘ব্যয় করতে হবে’ কোথায়

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾-এর অর্থ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। (তাফসীর তাবারী ১/২৪৩) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ), ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানব কর্তৃক তার সন্তান সন্ততিকে পানাহার করানো। এটা যাকাতের হুকুমের পূর্বেকার আয়াত। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, সূরাহ্ বারা’আতে যাকাতের যে সাতটি আয়াত আছে তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই নির্দেশ ছিলো যে, বান্দা যেন নিজ সাধ্যানুসারে কমবেশি কিছু দান করতে থাকে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ ‘এই মাল তোমাদের নিকট মহান আল্লাহর আমানত, অতি সত্বরই এটা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে তা থেকে মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করো।’

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি মুত্বলাক তথা সাধারণ। যাকাত, সন্তান সন্ততির জন্য খরচ এবং যেসব লোককে দেয়া প্রয়োজন এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ জন্য মহান আল্লাহ একটি সাধারণ বিশেষণ বর্ণনা করেছেন এবং সাধারণভাবে প্রশংসা করেছেন। কাজেই সব খরচই এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কুর’আনুল কারীমের অধিকাংশ জায়গায় সালাত ও মাল খরচ করার বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে। এ জন্য সালাত হচ্ছে মহান আল্লাহর হক এবং তাঁর ‘ইবাদত, যা তাঁর একাত্মবাদ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার নাম। আর খরচ করা হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা যার দ্বারা তাদের উপকার হয়। এর সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং দাসদাসী। তারপর দূরের লোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিরা তার হকদার। সুতরাং অবশ্য করণীয় সমস্ত ব্যয় ও ফরয যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) আল্লাহ তা‘আলার একাত্মবাদ ও নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রেরিতত্বের সাক্ষ্য প্রদান। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রামাযানের সিয়াম পালন করা এবং (৫) বায়তুল্লার হাজ্জ সম্পাদন করা। (হাদীস সহীহ। ফাতহুল বারী ১/৬৪, সহীহ মুসলিম ১/৪৫) এ সম্পর্কে আর বহু হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-সদকা প্রভৃতি যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। [তাফসীর তাবারী]

কুরআনে সাধারণত ‘ইনফাক’ নফল দান-সদকার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে "যাকাত" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে গায়েবের উপর ঈমান, এরপর সালাত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না।

আল্লাহর দেয়া রিযিক হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করা: আল্লামা আবদুর রহমান আস সা‘দী (রহঃ) তার স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন- এখানে ফরয যাকাত, ফরয ব্যয় যেমন পরিবার, নিকট আত্মীয় ও দাস-দাসীদের জন্য ব্যয় এবং সকল কল্যাণকর কাজে মুস্তাহাব দান-খয়রাতও অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে সা‘দী পৃ. ১৭)

একজন মু’মিন-মুত্তাকী ব্যক্তি যতই সম্পদের মালিক হোক না কেন সে সর্বদাই বিশ্বাস করে যে, এসব সম্পদ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা‘আলারই। তাই সে সর্বদাই আল্লাহ তা‘আলার পথে সম্পদ ব্যয় করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এরূপ ব্যয়কারীদের জন্য ফেরেশতা দু‘আ করে বলে: হে আল্লাহ! তুমি ব্যয়কারীর সম্পদ আরো বৃদ্ধি করে দাও। (সহীহ মুসলিম হা: ১০১০)। অপরপক্ষে যার ঈমান দুর্বল আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করা তার জন্য খুবই কঠিন ও কষ্টকর। সে আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে। তার জন্য ফেরেশতা বদ্দু‘আ করে বলে: হে আল্লাহ! তুমি কৃপণ ব্যক্তির সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (সহীহ মুসলিম হা: ১০১০) তবে ফরয যাকাত আদায়ের পর সাধারণ দানের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلٰي عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ)

“তুমি তোমার হাতকে তোমার গলায় গুটিয়ে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও কর না।” (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৯)

অর্থাৎ অতি কাপর্ণ্য কর না এবং অপব্যয়ও কর না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

(وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا)

“এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।” (সূরা ফুরকান ২৫:৬৭) সুতরাং মু’মিন-মুত্তাকীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে সাধ্যানুসারে সম্পদ ব্যয় করে।

চতুর্থ ও পঞ্চম বৈশিষ্ট্য- কুরআনসহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া : আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْکَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ)

“এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতে ঈমান আনে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।”

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণ যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তারা ঐ সমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করে। উভয়ের প্রতি ঈমান আনতে কোন পার্থক্য করে না, কোন কিছু অস্বীকারও করে না এবং পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মিযান ইত্যাদি সমস্ত পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ

আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে আর আখেরাতের ওপর একীন রাখে।

৪ নং আয়াতের তাফসীর:

এটি হচ্ছে পঞ্চম শর্ত।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তুমি তোমার রাব্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছো এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলো তারা ঐ সমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করে। এটা নয় যে, কোনটা মানে ও কোনটা মানেনা, বরং রবের সব কথাই বিশ্বাস করে এবং পরকালের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' (তাফসীর তাবারী ১/২৪৪) অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান ইত্যাদি সবই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯) কিয়ামত দুনিয়া ধ্বংসের পরে হবে বলে তাকে আখিরাত বলা হয়েছে।

ঈমানদারের বর্ণনা

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে পূর্বে যাদের অদৃশ্যের বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদি বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, তাদেরই দ্বিতীয় বার এই বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদার 'আরবেরই হোক অথবা আহলে কিতাবের হোক কিংবা অন্য যে কোন ধরনের লোক হোক। মুজাহিদ (রহঃ), আবুল 'আলিয়া (রহঃ) রাবী' ইবনু আনাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রহঃ)-এরও এটাই অভিমত।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এ দুটো একই কিন্তু এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে আহলে কিতাব। অতএব এ দু'অবস্থায় واو টি 'আতফের واو হবে এবং صفت এর 'আতফ হবে صفت এর ওপর। যেমনঃ

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىۙ۝ الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰىۙ۝ وَ الَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰىۙ۝ وَ الَّذِیْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى﴾

'তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। যিনি সৃষ্টি করেছেন তারপর করেছেন দেহের প্রতিটি অঙ্গকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণ মতো সৃষ্টি করেছেন, তারপর জীবনে চলার পথনির্দেশ করেছেন। যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন।' (৮৭ নং সূরাহ আল আ'লা, আয়াত নং ১-৪) এখানে صفت এর 'আতফ হয়েছে صفت এর ওপর। এই প্রকারের 'আতফ বা সংযোগ কবিদের কবিতাতেও এসেছে। তৃতীয় মত এই যে, প্রথম صفت গুলো তো হচ্ছে 'আরব মু'মিনদের আর নিচের আয়াতটি হতে আহলে কিতাবদের মধ্যেকার মু'মিনদের صفت ধরা হবে।

﴿وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ١ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ﴾

'আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।' (২ নং সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত নং ৪) আল

কুর'আন বিশারদ সুদ্দী (রহঃ) এটা ইবনু 'আব্বাস, ইবনু মাস'উদসহ অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু জারীরও এ মতটি সমর্থন করেছেন। অতঃপর প্রমাণ স্বরূপ তিনি অত্র আয়াত টি উল্লেখ করেছেন।

﴿وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ﴾

'আর আহলে কিতাবদের মধ্যকার কিছু লোক নিঃসন্দেহে এমনও আছে, যারা মহান আল্লাহ্‌র ওপর এবং তোমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের ওপর ঈমান রাখে।' (৩ নং সূরাহ আলি 'ইমরান, আয়াত- ১৯৯)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ 'সূরাহ্‌ বাক্বারার প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনদের আলোচনা রয়েছে এবং তার পরবর্তী আয়াতে মুনাফিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।' (তাফসীর তাবারী ১/২৩৯) সুতরাং এ চারটি আয়াত প্রত্যেক মু'মিনদের জন্য সাধারণ বা সমভাবে প্রযোজ্য। সে 'আরবী হোক, 'আযমী হোক, কিতাবী হোক, মানবের মধ্যে হোক বা দানবের মধ্যেই হোক না কেন। কারণ, এর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ অন্যের ক্ষেত্রেই একেবারে যরুরী শর্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা হতেই পারে না। অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত দেয়া শুদ্ধ নয়, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো তার ওপর ঈমান আনবে সাথে সাথে পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। যেমন প্রথম তিনটি পরবর্তী তিনটি ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রুপ পরবর্তী তিনটিও পূর্ববর্তী তিনটি ছাড়া পরিশুদ্ধ হয় না। এ জন্য ঈমানদারের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছেঃ

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো মহান আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো। (৪ নং সূরাহ্‌ নিসা, আয়াত নং ১৩৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ ﴾

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পারো যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং বলোঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ তো একই। (২৯ সূরাহ্‌ 'আনকাবূত, আয়াত নং ৪৬) অনুরূপভাবে অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

‘এর পূর্বে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম তারা অর্থাৎ তাদের কতক লোক তাতে বিশ্বাস করে। তাদের নিকট যখন তা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে- আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ সত্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত, এর পূর্বেই আমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু’বার দেয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং তারা ভালো দিয়ে মন্দের প্রতিহত করে আর আমি তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।’ (২৮ নং সূরাহ আল কাসাস, আয়াত নং ৫২-৫৪)

তাছাড়া সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

‘তিন প্রকার লোককে দ্বিগুণ নেকী দান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে শিক্ষা দান করে, উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, আদব শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে। তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিবাহ করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আর আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে মু’মিন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিলো। তারপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আর যে গোলাম মহান আল্লাহ্‌র হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং নিজ মনিবের দায়িত্বও সঠিকরূপে পালন করে, তার জন্যও দ্বিগুণ নেকী রয়েছে।’ (সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৭, আ.প্র. হাঃ ২৭৯০, ই.ফা. হাঃ ২৮০০, শামেলা ২৮৮৪। সহীহ মুসলিম, ৪০৪) ইমাম ইবনু জারীরের এই পার্থক্যের সম্বন্ধ এর দ্বারাও জানা যায় যে, এ সূরার প্রথমে মু’মিন ও কাফিরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন কাফিরের দু’টি অংশ আছে, কাফির ও মুনাফিক, অনুরূপ মু’মিনদের দু’টি ভাগ রয়েছে আর তা হলো, ‘আরবী মু’মিন ও কিতাবী মু’মিন। আমার (ইবনু কাসীর) মতে মুজাহিদ (রহঃ)-এর উক্তিটিই সঠিক।

পবিত্র কুর’আনের আরেক স্থানে ঘোষিত হয়েছেঃ

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾

হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। (৪ নং সূরাহ্ নিসা, আয়াত নং ৪৭) অন্য জায়গায় আছেঃ

﴿قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾

বলোঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইনজীল এবং যে কিতাব অর্থাৎ কুর'আন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার ওপর 'আমল করো। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ৬৮)

অন্য জায়গায় সমস্ত ঈমানদারকে সংবাদ প্রদান করে কুর'আনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ١ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ١ۙ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾

রাসূল তার প্রভু হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও বিশ্বাস করে; তারা সবাই মহান আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না। (২ নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ২৮৫) মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ لَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾

আর যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। (৪ নং সূরাহ্ নিসা, আয়াত নং ১৫২)

এ বিষয়ে আরো বহু আয়াত রয়েছে যাতে প্রত্যেক মুসলিমের মহান আল্লাহর ওপর, তাঁর সকল রাসূলের ওপর এবং সমস্ত কিতাবের ওপর ঈমান আনার কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের ঈমানদারগণের যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্য ভিন্ন কথা। কেননা তাদের কিতাবের ওপর তাদের ঈমান হয় পূর্ণ পরিণত। তারপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন কুর'আনুল হাকীমের ওপরও তাদের ঈমান পূর্ণ পরিণত হয়ে থাকে। এ জন্যই তারা দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়। এই উম্মাতের লোকেরাও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনে বটে, কিন্তু তাদের ঈমান হয় সংক্ষিপ্ত আকারে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে, মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'আহলে কিতাব তোমার নিকট কোন সংবাদ প্রচার করলে তোমরা তাকে সত্যও বলো না আর মিথ্যাও বলোনা, বরং বলে দাও- যা কিছু আমাদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার ওপরও

বিশ্বাস করি এবং যা কিছু তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস রাখি।' (সুনান আবূ দাঊদ, ৪/৫৯) কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনে, তুলনামূলভাবে আহলে কিতাব অপেক্ষা তাদের ঈমানই বেশি পূর্ণ ও দৃঢ় হয়। এই হিসেবে তারা হয়তো আহলে কিতাব অপেক্ষা বেশি সাওয়াব লাভ করবে; যদিও তারা তাদের নবী (আঃ)-এর ওপর এবং শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঈমান আনার কারণে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী। কিন্তু এরা ঈমানের পরিপক্কতার কারণে সাওয়াবে তাদের সমান। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

কুরআনসহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْکَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ)

"এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতে ঈমান আনে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণ যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তারা ঐ সমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করে। উভয়ের প্রতি ঈমান আনতে কোন পার্থক্য করে না, কোন কিছু অস্বীকারও করে না এবং পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মিযান ইত্যাদি সমস্ত পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে।

অর্থাৎ আল্লাহ অহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাযিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান অবতরণের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এজন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করে অথবা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি দিলেও কেবলমাত্র সেই কিতাবটি বা কিতাবগুলোর ওপর ঈমান আনে যেগুলোকে তাদের বাপ-দাদারা মেনে আসছে আর এ উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য বিধানগুলোকে অস্বীকার করে –তাদের সবার জন্য কুরআনের হিদায়াতের দুয়ার রুদ্ধ। এ ধরনের সমস্ত লোককে আলাদা করে দিয়ে কুরআন তার অনুগ্রহ একমাত্র তাদের ওপর বর্ষণ করে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহর এ বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে না এসে বরং নবীদের ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই মানুষের কাছে আসে বলে স্বীকার করে আর এই সঙ্গে বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত হয় না

বরং নির্ভেজাল সত্যের পূজারী হয়, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেন তারা তার সামনে মস্তক অবনত করে দেয়।

তাওরাত ও ইঞ্জিলে ঈমান আনয়নকারী ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না বরং তারা জাহান্নামী হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

এ উম্মাতের কোন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান আমি যে রিসালাত দিয়ে প্রেরিত হয়েছি সে কথা শোনার পর তার প্রতি ঈমান না আনলে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (সহীহ মুসলিম হা: ১৫৩, নাসায়ী হা: ১২৪১ সিলসিলা সহীহাহ হা: ৩০৯৩)

অপরপক্ষে তাওরাত বা ইঞ্জিলের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনলে তাদের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। যেমন সাহাবী আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তিন ব্যক্তিকে তার কাজের বিনিময়ে দ্বিগুণ পুণ্য দেয়া হবে- ১. ঐ আহলে কিতাব যে তার নাবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং সেই সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে ২. সেই কৃতদাস যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং সেই সঙ্গে তার মুনিবের হক আদায় করে এবং ৩. ঐ ব্যক্তি যার নিকট কৃতদাসী রয়েছে সে তাকে ব্যবহার করে, এরপর সে তাকে উত্তম শিক্ষা দেয় এবং আযাদ দিয়ের তাকে বিয়ে করে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান। (সহীহ বুখারী হা: ৯৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৫৪)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন: সূরা বাকারার প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, পরের দু'টি আয়াতে কাফিরদের আলোচনা এবং পরের ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে।

অতএব এ চারটি আয়াত প্রত্যেক মু'মিন মুত্তাকীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সে আরবি হোক বা অনারবী হোক, মানব হোক বা দানব হোক।

কেননা এগুলো এমন গুণ যা একটি অন্যটির সম্পূরক। তাই কেউ গায়েবের প্রতি ঈমান আনল, সালাত কায়িম করল, যাকাত দিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তাতে ঈমান আনল না, সে মূলত পূর্ববর্তী রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনল না এবং আখিরতের প্রতিও

বিশ্বাস করল না, তার সালাত, যাকাত কোন কাজে আসবে না। পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবকে সাধারণভাবে বিশ্বাস করতে হবে, আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল কুরআন ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে সূরা নিসার ৪৬ ও ১৩৭ নং আয়াতে, সূরা আনকাবুতের ৪৬ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছে তার প্রতি ঈমান ও পূর্ববর্তী নাবীগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতিও ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সূরা বাকারার ২৮৫ নং আয়াতে, সূরা যুমারের ১৫২ নং আয়াতে সকল নাবী-রাসূলের প্রতি কোন পার্থক্য ছাড়াই ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

অতএব সকলকে ঈমানের প্রত্যেক রুকনের প্রতি সমানভাবে ঈমান আনতে হবে। তাহলেই প্রকৃত মু’মিন-মুত্তাকী হওয়া সম্ভব। আল্লাহ তা‘আলা পূর্বের আয়াতসমূহে যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যারা ঐ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে তাদেরকে ৫ নং আয়াতে তার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তারা হিদায়াতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। অর্থাৎ তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে। তাকওয়া অবলম্বনের আরো ফলাফল হল- দুনিয়া ও আখেরাতে সফল ও সার্থক হওয়া সম্ভব। দুনিয়ার সফলতা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا)

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন।” (সূরা তালাক ৬৫:২) যে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করে আল্লাহ তা‘আলা তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ أَمْرِهٖ يُسْرًا)

“আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেন।” (সূরা তালাক ৬৫:৪) তাকওয়া অবলম্বন করলে পাপরাশি মোচন করে দেয়া হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا)

“আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।”(সূরা তালাক ৬৫:৫)

পরকালের সফলতা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّعُقْبَي الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ)

“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্র“তি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ যে, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল জাহান্নাম।”(সূরা রা‘দ ১৩:৩৫)

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ)

“আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের, কোন দূরুত্ব থাকবে না।”(সূরা কাফ ৫০:৩১) সুতরাং শুধু মৌখিক দাবির মাধ্যমে মু’মিন-মুত্তাকী হওয়া যায় না, এ জন্য আকীদাহ, আমল ও আখলাকে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ শর্ত।

এ আয়াতে মুত্তাকীগণের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস বা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। ইসলামী বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারীগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা

নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধারূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুস্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা অসামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি কোন আইনেরও নেই, এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের দাঁত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যকটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না। প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকারভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাংখা পর্যন্ত এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সংগে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত। এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে (يُؤمِنُوْنَ) শব্দ ব্যবহার না করে (يُوْقِنُوْنَ) ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াকীন অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়। যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে। এ দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব নির্ধারণে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াকীন হচ্ছে পূর্ণ ঈমান" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৬]

মুত্তাকীদের এই গুণ আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাবনিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীআত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরী'আতের বিচারে তাকে মুমিনও বলা হয়, কিন্তু কুরআন যে ইয়াকীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াকীন থাকতে পারে না। আর সে কুরআনী ইয়াকীনই মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়াত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

একঃ এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীব নয়। বরং নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

দুইঃ দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চিরন্তন নয়। এক সময় এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সে সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তিনঃ এ দুনিয়া শেষ হবার পর আল্লাহ আর একটি দুনিয়া তৈরি করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের জন্ম হয়েছে সবাইকে সেখানে একই সঙ্গে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসেব নেবেন। সবাইকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

চারঃ আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং অসৎলোকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

পাঁচঃ বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, সাফল্য ও ব্যর্থতার আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্তরে যাবে সে-ই হচ্ছে সফলকাম আর সেখানে যে উত্তরোবে না, সে ব্যর্থ।এ সমগ্র আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে যারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তারা কুরআন থেকে কোনক্রমেই উপকৃত হতে পারবে না। কারণ এ বিষয়গুলো অস্বীকার করা তো দূরের কথা এগুলো সম্পর্কে কারো মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের জন্য কুরআন যে পথনির্দেশ করেছে সে পথে তারা চলতে পারবে না।

সুরা ঃ আল-বাকারাহ

আয়াত নং-৫

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তারাই তাদের প্রভুর হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আর তারাই সফলকাম।

৫ নং আয়াতের তাফসীর:

হিদায়াত ও সফলতা শুধু ঈমানদারদের জন্য

ঐ সব লোক, যাদের গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেমন অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনা, সালাত কায়িম করা, মহান আল্লাহর দেয়া বস্তু হতে দান করা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান আনা, তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রেখে সেখানে উপকার দেয় এরূপ কাজ করা এবং মন্দ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা। এসব লোকই হিদায়াত প্রাপ্ত, এদেরকেই মহান আল্লাহর নূর ও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর এ সমুদয় লোকের জন্যই ইহকালে ও পরকালে সফলতা রয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) 'হিদায়াতের' তাফসীর করেছেন নূর ও দৃঢ়তা দ্বারা এবং 'ফালাহ' এর তাফসীর করেছেন প্রয়োজন মিটে যাওয়া ও পাপ এবং দুষ্কার্য থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারা।

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেছেন, এসব লোক স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে নূর, দালীল, দৃঢ়তা এবং সত্যতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর তারাই তাদের পবিত্র কার্যাবলীর কারণে পুণ্য ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের দাবীদার এবং তারাই শাস্তি হতে দূরে সরে থাকবে। ইবনু জারীর (রহঃ) আরো বলেন যে, দ্বিতীয় أُوْلَئِكَ এর ইঙ্গিত হয়েছে আহলে কিতাবের দিকে, যার صفت তার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ হিসেবে وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ প্রথম আয়াত হতে পৃথক হবে এবং مبتداء হয়ে مرفوع হবে এবং তার خبر হবে اولئك هم المفلحون। কিন্তু তার ইঙ্গিত পূর্বোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারীদের দিকে হওয়াই বেশি পছন্দনীয়।

যারা মুত্তাকী তারাই সফলকাম। এখানে মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করার পরে হিদায়াতের জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তারাই তাদের রব-এর দেয়া হিদায়াত পাবে এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ্‌র এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে। বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, সাফল্য ও ব্যর্থতা আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহ্‌র শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্তরে যাবে, সে-ই হচ্ছে সফলকাম। আর সেখানে যে উত্তরোবে না, সে ব্যর্থ।

সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হিদায়াত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হিদায়াতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হিদায়াতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কুরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচারণের পথ অবলম্বন করেছে। কুরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ

অবলম্বন করেছে; মুসলিমদের নিকট বলে, আমরা মুসলিম; কুরআনের হিদায়াত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর বা অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলিমদের ধোকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কুরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনরটি আয়াত যারা কুরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭নং আয়াতে যারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতই মুনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-বাকারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হিদায়াতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছেন যে, এর উৎস হচ্ছে তাঁর কিতাব এই কুরআন; অপরদিকে সৃষ্টিজগতকে এ হিদায়াত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুত্তাকী বলেছেন, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফেক বলেছেন। কুরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মু'মিন-মুত্তাকী তারাই যারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তাদের আদেশ ও নিষেধাবলী জীবনের সর্বক্ষেত্রে পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

২. মু'মিন-মুত্তাকীদের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য- গায়েবের প্রতি ঈমান আনা, সালাত কায়িম করা, আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা।

৩. গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি ছাড়া কোন নাবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া, গাউস-কুতুব, পীর-দরবেশ ইত্যাদি ব্যক্তিরা গায়েব জানে না। তবে আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে নাবী-রাসূলদের যতটুকু জানান তা ব্যতীত।

৪. মু'মিনরা সালাতের ব্যাপারে খুব সচেতন। তারা যথাসময়ে জামাআতের সাথে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহীহ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে থাকে। এটাই হল ইকামাতুস সালাত।

৫. গায়েব জানার একমাত্র মাধ্যম ওয়াহী। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতেকালের পর ওয়াহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং কারো গায়েব জানার সুযোগ নেই। ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে গায়েব জানা যায় না।

৬. ঈমানের রুকন ছয়টি- আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এযবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। এসবগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। কোন একটি রুকনকে অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।